শতাব্দীর মোহনায় সিডনি

প্রদীপ দেব

০২

ফ্রাঙ্কলিন স্ট্রিটে কোয়ান্টাস এয়ারলাইনসের বহুতল ভবনের পাশের ভবনেই গ্রেহাউন্ড বাস টার্মিনাল। মেলবোর্নের সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাল স্পেনসার স্ট্রিটে, বাস ট্রেন ট্রাম একই জায়গায়। এয়ারপোর্টে যাবার স্কাইবাসও ছাড়ে সেখান থেকে। এখানকার এই টার্মিনালটা শুধুমাত্র গ্রেহাউন্ড বাস কোম্পানির জন্য। উত্তর আমেরিকায় এই কোম্পানি দোর্দন্ড প্রতাপে যাত্রী পরিবহন ব্যবসা করছে। অস্ট্রেলিয়ায় হাতে গোনা আরো কয়েকটি ইন্টারস্টেট বাস কোম্পানি থাকলেও গ্রেহাউন্ডের তুলনায় সেগুলো বড়জোর পুষি বেড়াল। আমার বাস রাত পৌনে ন'টায়। এখন রাত আটটা। রাত মানে নামেই রাত, কিন্তু এখনো আকাশে সূর্য ঝলমল করছে। গ্রীষ্মকালে এখানে সূর্যাস্ত হয় রাত সাড়ে ন'টার দিকে।

সোয়া আটটায় চেক ইন করে বোর্ডিং পাস নিয়ে বসে রইলাম। টিকেট কেনার সময় বাসের সিট নাম্বার দেয়া হয় না। চেক ইন করার পর সিট বন্টন করা হয়। এত আগে চেক ইন করার পরেও কেন যে বাসের একদম পেছনের দিকে সিট পেলাম জানিনা। তবে কি চেক ইন করার আরো কোন ব্যবস্থা আছে, নাকি আমার চেহারা দেখেই আমাকে পেছনের দিকে পাঠিয়ে দিয়েছে কে জানে। সাড়ে আটটায় বোর্ডিং শুরু হলো। আমাদের দেশের ঢাকা-চট্টগ্রামের বাসের মতোই ব্যবস্থা। তবে আমাদের মতো অত হৈ চৈ নেই, প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় অনেক মানুষের সমাবেশ নেই, একটা বাসে তিনচারজন হেল্পার, কন্ডাক্টর বা ড্রাইভারের পাশে বসে অনবরত কথা বলা আর বিড়ি ফোঁকার অলস মানুষ নেই। এখানে চেক ইন কাউন্টারের চটপটে তরুণী বাসের দরজায় দাঁড়িয়ে যাত্রীদের বোর্ডিং পাস দেখে হাসি মুখে বাসে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

আমার সিট জানালার ধারে। আমার পাশে বসেছেন একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক। পাশের সারিতে বসা তাঁর স্ত্রী আর দুই শিশুপুত্রের সাথে তাঁর কথোপকথন থেকে বুঝতে পারছি তারা জাপানী। মেলবোর্নে অবশ্য চৈনিকদের তুলনায় জাপানী অভিবাসীর সংখ্যা অনেক কম। শুনেছি কুইনসল্যান্ডের দিকে প্রচুর জাপানী আছে। জাপানীরা মিশুক জাতি। একটু পরেই আলাপ জমে গেলো ভদ্রলোকের সাথে। তাঁর ইংরেজী উচ্চারণ অস্পষ্ট। আন্দাজে বুঝে নিতে হলেও এধরণের আলাপে কোন অসুবিধা হয় না। এ যে ভদ্রতা রক্ষার প্রচলিত পদ্ধতি।

ঠিক পৌনে নটায় ড্রাইভার তার হ্যান্ডমাইক নিয়ে একটা লেকচার দিলেন। এতবড় বাসে তিনি একাই ড্রাইভার। তার কোন হেল্পার বা কন্ডাক্টরও নেই। লেকচারে বাসের নিয়ম কানুন ইত্যাদি সম্পর্কে বলছেন হয়তো, কিন্তু আমি তার কয়েকটা শব্দ ছাড়া আর কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমার শোনার কান তৈরি হয়নি এখনো, অথবা ড্রাইভার সাহেবের উচ্চারণই

বাজে। সে যাই হোক। তার কথা কেউ মন দিয়ে শুনছে বলে মনে হচ্ছে না। ড্রাইভার তার রুটিন ওয়ার্ক করছেন। বাসে সিটবেল্ট আছে, কিন্তু তা বেঁধে বসা বাধ্যতামূলক কিনা জানিনা। গাড়িতে তো সিটবেল্ট না বাঁধলে ১৬৫ ডলার ফাইন। এদেশে রাস্তাঘাটে অনিয়মের জন্য ফাইন দিতে হয় নানারকম। রাস্তা পারাপারের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা ছাড়া যেখানে সেখানে রাস্তা ক্রস করতে গিয়ে ধরা পড়লে নাকি পথচারীকেও চল্লিশ ডলার ফাইন গুণতে হয়।

দিনের আলো আছে এখনো। থাকবে আরো মিনিট চল্লিশেক। মেলবোর্ন শহরের কয়েকটা বড় রাস্তা পেরিয়ে মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস ডানে রেখে বাস এগিয়ে চলেছে হিউম হাইওয়ে ধরে সিডনির পথে। রোডসাইড ডিরেকশান বোর্ডে দেখা গেলো সিডনি ৯৯৫ কিলোমিটার। বাসের গতি ক্রমশ বাড়ছে। জানালায় চোখ রেখে তাকিয়ে আছি যতদূর দেখা যায়। শহরের মাঝখানে এতদিন কাটিয়ে ঠিক বুঝতে পারিনি এদেশ এত সবুজ। এখন অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভায় অদ্ভুত মায়াবী লাগছে। সূর্য ডুবে যাবার সাথে সাথেই যেন বৃষ্টি নামলো। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়া দেখিনা কত দিন হয়ে গেলো। এখানের বৃষ্টি বড় বেশি ছন্দবিহীন। চারপাশ অন্ধকার। রাস্তায় গাড়ির হেডলাইট ছাড়া আর কোন আলো নেই অনেক দূর পর্যন্ত। মাঝে মাঝে ছোট ছোট টাউনশিপ। আলো ঝলমলে মফস্বলের বিপণীকেন্দ্র। বাইরে তেমন কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তবু তাকিয়ে আছি বাইরের দিকে। আকাশে অনেক তারা। এই আকাশের তারা কি বাংলাদেশ থেকেও দেখা যায়। এতদিন পরে মনে হচ্ছে একটু অবসর পেয়েছি নিজের সাথে কথা বলার, ফেলে আসা স্মৃতির হাত ধরে মনের বারান্দায় একটু হাঁটার।

বাসে প্রায় সবাই ঘুমাচ্ছে। জাপানীদের ছোট বাচ্চাটি কেঁদে উঠলো একবার। একটু পরেই মায়ের আদর খেয়ে চুপ করে গেলো। আর কোন শব্দ নেই। ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে বাসের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায়। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানিনা। ঘুম ভাঙলো প্রথম যাত্রাবিরতিতে। বাস পঁয়তাল্লিশ মিনিট থামবে এখানে। বাস থেকে নিচে নেমে এলাম।

জায়গাটার নাম কী ঠিক বুঝতে পারছি না। আশেপাশে খুব বেশি দোকান পাট নেই। পেট্রোল স্টেশানের সাথে লাগানো রেস্টুরেন্ট আর শপিং সেন্টার। এরা বলে সার্ভিস সেন্টার। সব পেয়েছির দোকান। বাতাস খুব ঠান্ডা। ডিসেম্বর মাসের প্রচন্ড গরমেও শীত কালের হাওয়া। বলা হয় মেলবোর্নের আবহাওয়ার মেজাজ ধনীলোকের একমাত্র সুন্দরী মেয়ের মেজাজের মতোই ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। তবে কি এখনো মেলবোর্ন তথা ভিক্টোরিয়া স্টেটের সীমানা পার হইনি? হয়তো। সীমানা তো আর ছোট নয়। অস্ট্রেলিয়া বিশাল দেশ। শুধুমাত্র ভিক্টোরিয়া স্টেটের আয়তন বাংলাদেশের আয়তনের চেয়ে অনেক বড়। বাসের অন্যান্য যাত্রীরাও হাঁটছে এদিক ওদিক। বাসে সিগারেট খাওয়া যায় না বলে ধূমপায়ীরা এখন আরাম করে সিগারেটে টান দিচ্ছে। রাত বারোটা। কেমন শুনশান চারদিকে। মেইন রোড থেকে একটু ভিতরে এই সার্ভিস স্টেশান। রাস্তায় ডাকবিভাগের গাড়ি ছুটে যাচ্ছে এক্সপ্রেস মেইল নিয়ে। বিশাল দৈর্ঘ্যের লরী যাচ্ছে একটার পর একটা। দিনের বেলায় সাধারণত এগুলোকে চলতে দেখা যায় না। আমাদের বাসে যাত্রী সংখ্যা চুয়াল্লিশ জন। যার প্রায় অর্ধেক মেয়ে। অনেকেই ভ্রমণ

করছে একাকী। বাংলাদেশে বেড়ে ওঠা আমি মুগ্ধ হই মেয়েদের স্বাচ্ছন্দ্য সাবলীলতা দেখে। এ দেশের মেয়েরা কি আমাদের দেশের মেয়েদের চেয়ে বেশি মেধাবী? গায়ে কি তাদের বেশি শক্তি আমাদের চেয়ে? তবে তারা পারে আমরা পারি না কেন? উত্তর পেতে দেরি হয়না। আমরা পারিনা, কারণ আমরা এখনো মেয়েদের মেয়ে হিসেবে না দেখে মানুষ হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠিনি। তবে হবে আস্তে আস্তে। আমাদের দেশের প্রেক্ষিত আর এদেশের প্রেক্ষিত তো এক নয়। এদেশের পরিবেশে বেড়ে ওঠা বাংলাদেশী মেয়েরাও সমান সাবলীলতায় পা ফেলে চলছে এখানে।

বাস আবার চলতে শুরু করলো। ড্রাইভার জানিয়ে দিলেন ভোর পাঁচটায় আবার থামবেন। ঘুমানো ছাড়া আর কিছু করার নেই আপাতত। একটু অস্বস্তি লাগছে কাল সকালে গিয়ে একটা অচেনা বাড়িতে আতিথ্য গ্রহন করতে হবে ভেবে। পাঁচটায় আবার একটা সার্ভিস সেন্টারে গাড়ি থামলে ঘুম ভেঙে গেলো। নিচে নামলাম না আর। আস্তে আস্তে আকাশ ফর্সা হয়ে উঠছে। এসময় রোদ উঠে যাবার কথা। কিন্তু আকাশ বেশ মেঘলা। বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে। বৃষ্টিতে বেড়াতে ভালো লাগে না। বৃষ্টি হলো ঘরের ভেতর জানালার পাশে বসে উপভোগ করার বিষয়। সাতটায় লিভারপুল স্টেশানে বাস থামলো। এখানে নেমে গেলো জাপানী পরিবার। রাস্তায় গাড়ি চলাচলের হার বেড়ে গেছে। অনেক বড় বড় এলাকা জুড়ে কেবল গাড়ি আর গাড়ি। পুরনো গাড়ির দোকান। শুনেছি অস্ট্রেলিয়ায় নাকি পুরনো গাড়ি আমদানী করা যায় না। তবে কি এগুলো সব এদেশে ব্যবহৃত গাড়ি?

সিডনির কাছে চলে এসেছি। দেখা যাচ্ছে সিডনি শহরের বিরাট বিরাট ইমারত। বিল্ডিং গুলোর আলাদা কোন বিশেষত্ব চোখে পড়ছে না; মেলবোর্নের বিল্ডিং এর মতোই। বেশ জোরেই শুরু হয়েছে বৃষ্টি। ভালো লাগছে না বৃষ্টির তোড় দেখে। এখানের বৃষ্টি মেলবোর্নের বৃষ্টির মতো মিনমিনে নয়, মনে হচ্ছে বাংলাদেশের বৃষ্টির মতোই জোর আছে পতনে। বৃষ্টিতে আর যাই হোক, সারাক্ষণ মাথায় ছাতা ধরে নতুন শহর দেখার আনন্দ পাওয়া যায় না। কী জানি, দায়ে পড়লে হয়তো সব কিছুই সহ্য হয়ে যায়।